আহ্বান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই। পৈত্রিক বাড়ি যা ছিল ভেঙেচুরে ভিটেতে জঙ্গল গজিয়েছে। এ অবস্থায় একদিন গিয়েচি দেশে কিসের একটা ছুটিতে।

গ্রামের চক্কোত্তি মশায় বাবার পুরাতন বন্ধু। আমায় দেখে খুব খুশি হোলেন। বল্লেন—কতকাল পরে বাবা মনে পড়ল দেশের কথা?

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। বল্লেন—এসো, এসো, বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও। বাড়ীঘর করবে না?

—আজ্ঞে সামান্য মাইনে পাই—

—তাতে কি? গ্রামের ছেলে গ্রামে বাস করবে, এতে আর সামান্য মাইনে বেশি মাইনে কি? আমি খড়-বাঁশ দিচ্চি, চালাঘর তুলে ফেলো, মাঝে মাঝে যাতায়াত করো। আহা নরেশের ছেলে, দেখেও সুখ। ক'দিনই বা আছি। বাস করো গাঁয়ে।

আরও অনেকে এসে ধরলে, অন্তত খড়ের ঘর একটা ওঠাতে হবে।

অনেকদিন পরে গ্রামে এসে লাগচে ভালোই। যাদের বাল্যকালে ছোট দেখে গিয়েচি, তাদের আর চেনা যায় না, যাদের যুবক দেখে গিয়েছিলাম, তারা হয়েচে বৃদ্ধ।

বড় আমবাগানের মধ্য দিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছি, আমগাছের ছায়ায় একটি বৃদ্ধের চেহারা ভারতচন্দ্র বর্ণিত জরতীবেশিনী অন্নপূর্ণার মত। কোনো তফাৎ নেই, ডান হাতে নড়ি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে বোধহয় বা বাজারের দিকেই চলেছে। বগলে একটা ছোট থলে।

বুড়ীকে দেখেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এ ধরনের বুড়ীকে দেখে আমার বড় মায়া হয়—নারী-রূপের এক অপূর্ব পরিণতি।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাবে?

—বাজারে বাবা—

বুড়ী আমায় ভালো না দেখতে পেয়ে কিংবা চিনতে না পেরে ডান হাত উঁচিয়ে

তালু আড়ভাবে চোখের ওপর ধরলে।

বল্লে—কে বাবা তুমি? চেনলাম না তো?

—চিনবে না। বাঁড়ুজ্যেপাড়ার নরেশ বাঁড়ুজ্যের ছেলে। আমি অনেকদিন গাঁয়ে আসিনি—

—তা হবে বাবা। আমি আগে তো এপাড়া-ওপাড়া যাতাম আসতাম না—তিনি থাকতি অভাব ছেলো না কোনো জিনিসের। গোলা-পোরা ধান, গোয়ালপোরা গরু—

—তোমাকে তো চিনতে পারলাম না বুড়ী?

—আমার তো তেনার নাম করতি নেই বাবা। করাতের কাজ করতেন।

বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে, অর্থাৎ আমি চিনতে পেরেচি কি না। কিন্তু আমার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়, আমার বাল্যকালে কে এ গ্রামে করাতের কাজ করতো তা আমার মনে থাকবার কথা নয়। বল্লাম—তোমার ছেলে আছে?

—কেউ নেই বাবা, কেউ নেই। এক নাতজামাই আছে তো সে মোরে ভাত দেয় না। ওই আমার নাতনীকে রেখে মোর মেয়ে মারা যায়। আমার বড্ড কষ্ট, ভাত জোটে না সবদিন। বাজারে যাচ্ছি তিন পয়সার নুন কিনে আনবো—দুটো ক'টা চাল যোগাড় করিচি ও-বেলা।

বুড়ীকে পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে দিলাম।

ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে ভেবেছিলাম, কিন্তু তা চুকলো না—উপরন্তু এই বুড়ীকে কেন্দ্র করে আমার জীবনে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার শুরু হলো। নিজের জীবনে না ঘটলে বিশ্বাস করতাম না এমন ঘটনা।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠেচি, এমন সময় কালকের সেই বুড়ী লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে এসে হাজির উঠোনে। থাকি এক জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ী। তিনি বল্লেন—ও হলো করাতীর স্ত্রী—অনেকদিন মরে গিয়েচে জমির। তোমাদের খুব ছেলেবেলায়।

বুড়ী উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলে—ও বাবা—

সে বোধহয় চোখে একটু কম দেখে। ও বয়েসে সেটা অবশ্য তেমন আশ্চর্যই বা কি। বল্লাম—এই যে আমি এখানে।

—কাল পয়সা ক'টা পেয়ে ভাবলাম যাই দিনি বাওন পাড়ার দিকি। কে পয়সা দিলে চিনতেও পারলাম না। বিকেলবেলা চোখে ঠাহর পাইনে।

আমার খুড়োমশায় বুড়ীকে বুঝিয়ে দিলেন আমি কে। সে উঠানের কাঁঠাল-তলায় বসে আপনমনে খুব খানিকটা বকে উঠে গেল। তার যাবার সময় আরও দু-একটা পয়সা দিলাম।

পরদিন কলকাতা চলে গেলাম। ছুটি ফুরিয়ে গেল। আমার জ্ঞাতি খুড়োকে কিছু টাকা দিয়ে এলাম আসবার সময়ে, আমার জন্যে ছোটখাটো দেখে একটি খড়ের ঘর তুলে রাখবার জন্যে।

কয়েক মাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে আমার সেই নতুন-তৈরী খড়ের ঘরখানাতে এসে উঠলাম। কলকাতাতে কর্মব্যস্ত এই ক'মাসের মধ্যে বুড়ীকে একবার মনেও পড়েনি বা এখানে এসেও মনে হঠাৎ হয়তো হতো না, যদি সে তার পরের দিনই সকালে আমার ঘরের নিচু দাওয়ায় এসে না বসে পড়তো।

বল্লাম কি বুড়ী ভালো আছো?

ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত থেকে গোটাকতক আম খুলে আমার সামনে মাটিতে রেখে বল্লে—আমার কি মরণ আছে রে বাবা!

জিজ্ঞেস করলাম—ও আম কিসের?

দন্তহীন মুখে একটু হাসবার চেষ্টা করে বল্লে—অ গোপাল আমার, তোর জন্যি নিয়ে অ্যালাম। গাছের আম বেশ মিষ্টি, খেয়ে দেখো এখন।

আমি ওর সম্বোধনের নতুনত্বে কৌতুক অনুভব করলাম, কিন্তু কি জানি কেন বড় ভালো লাগলো। গ্রামে অনেকদিন থেকে আপনার জন কেউ নেই, একটা ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন করার লোকের দেখা পাইনি বাল্যকালে মা পিসিমা মারা যাওয়ার পর থেকে। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে অত বেশি বয়সের স্ত্রীলোক কেউ নেই যে আমাকে 'গোপাল' বলে ডাকে।

বুড়ী বল্লে—খাও কোথায় হ্যাঁ বাবা।

—খুড়োমশায়ের বাড়ী।

—বেশ যত্ন করে তো ওনারা?

—তা করে।

—দুধ পাচ্চ ভালো?

—ঘুঁটি গোয়ালিনী দেয়, মন্দ না।

—ও বাবা, ওর দুধ! আদ্ধেক জল—দুধ খেতি পাচ্চ না ভালো সে বুঝিচি।

পরদিন সকাল হয়েচে সবে, বুড়ী দেখি উঠোনে এসে ডাকচে—অ গোপাল—

বিছানা ছেড়ে উঠে বল্লাম—আরে এত সকালে কি মনে করে? হাতে কি?

বৃদ্ধা হাতের নড়ি আমার দাওয়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বল্লে—এক ঘটি দুধ আনলাম তোর জন্যি।

—সে কি! দুধ এত পেলে কোথায় এত সকালে।

—আমায় মা বলে ডাকে ওই হাজরা ন্যাটার বৌ। তার কেউ নেই, মোর

চালাঘরের পাশে ওর চালাঘর। ওরে কাল রাত্তিরে বলে রেখে দিয়েছিলাম, বলি বৌ, আমার গোপাল দুধ খেতি পায় না। সকালে চা না কি খায়, ওরে খুব ভোরে উঠে গাই দুয়ে দিতে হবে। তাই আজ কুঁকড়ো-ডাকা ভোরে উঠে দেখি আমাদের ডাকচে—মা ওঠো, তোমার গোপালের জন্যি দুধ নিয়ে যাও—

—আচ্ছা কেন বলো তো তোমার এসব! ছিঃ—না এসব ভালো না। এ রকম আর কখনো এনো না। কত পয়সা দাম দিতে হবে বলো। কতটা দুধ?

আমার গলার সুর একটু রুক্ষ হয়ে উঠেছিল হয়তো, কারণ মুসলমানের বাড়ীর দুধ আমাদের গ্রামে চলে না, কোন দিক্ থেকে দেখে ফেলবে এই ছিল আমার ভয়। কেন আবার এসব ঝঞ্ঝাট জোটে!

বুড়ী আমার কণ্ঠস্বরের অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় যেন একটু ঘাবড়ে গেল, ভয়ে ভয়ে বল্লে—কেন বাবা, পয়সা কেন?

—পয়সা না তো তুমি দুধ পাবে কোথায়?

—ওই যে বল্লাম বাবা, আমার মেয়ের বাড়ী থেকে—

—তা হোক, তুমি পয়সা নিয়ে যাও। সেও তো গরীব লোক—

বুড়ী পয়সা নিয়ে চলে গেল বটে কিন্তু সে যে বেশ দমে গিয়েচে তার কথাবার্তার ধরনে বেশ বুঝতে পারলাম।

মনে একটু কষ্ট হোল বুড়ী চলে গেলে, পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়েচে কি? বুড়ীর কিরকম মন পড়ে গিয়েচে আমার ওপর। স্নেহের দান—এমন করা ঠিক হয়নি।

বুড়ী কিন্তু এ অবহেলা গায়ে মাখলো না আদৌ। প্রতিদিন সকাল হতে না হতে সে এসে জুটবে।

—অ গোপাল, এই দুটো কচি শসার জালি মোর গাছের—এই ন্যাও। নুন দিয়ে খাও মোর সামনে?

—বুড়ী তোমার চলে কিসে?

—নাতজামায়ের দেবার কথা, তা সে সবদিন দেয় না। ওই যারে মেয়ে বলি, ও বড্ড ভালো। লোকের ধান ভানে, তাই চাল পায়, আমারে দুটো না দিয়ে খায় না।

—একা থাকো?

—তা একদিন মোর ঘরখানা না হয় দেখতি গেলে, অ মোর গোপাল! আমি নতুন খাজুর পাতার চেটাই বুনে রেখে দিয়েলাম তোমারে বসতি দেবার জন্যি। বাউনের ছেলে, মোদের এঁটোকাঁটা মাদুরে কি বসবে? তাই বলি একটা নতুন চেটাই বুনে রাখি, যখন আসবে এখানেতেই বসবে।

সেবার বুড়ীর বাড়ীতে আমার যাওয়া ঘটে উঠলো না ওর এত আগ্রহ সত্ত্বেও।

নানা-দিকে ব্যস্ত থাকি, তার ওপর আছে সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের দাবি। অনেকদিন পরে গ্রামে এসেছি তো! যে ক'দিন গ্রামে থাকি, বুড়ী রোজ সকালে একবার আসতে ভুলবে না। কিছু-না-কিছু আনবেই—কখনও পাকা আম, কখনও পাতি নেবু, কখনও এক কড়া কাঁচকলা কি এক ফালি কুমড়ো। দু-আনা চার-আনা প্রায়ই দিই। একদিন একখানা কাপড় দিলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করে আসচি, বুড়ী কোনোদিন আমার কাছে কিছু মুখ ফুটে চায়নি। কখনও বলেনি, পয়সা দাও কি অমুক দাও। বরং তার উল্টো, শুধু হাতে কখনও আসে না।

একবার কলকাতা থেকে কয়েকটি বন্ধু গেলেন দেখা করতে।

গ্রামে এত সকালে কেউ উনুন ধরায় নি, বুড়ী লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে এসে হাজির। বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক দিল—অ মোর গোপাল!

হঠাৎ আমার লজ্জা করতে লাগল। কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের সামনে, ও আজ না এলেই পারতো ছাই। ভালো বিপদ!

—অ মোর গোপাল! ঘরে আছিস নাকি?

ঈষৎ বিরক্তির স্বরেই উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, কেন?

—এই এয়েলাম, বলি যাই গোপালকে দেখে আসি একবার।

বন্ধুদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলেন—ও কে হে?

চাপা দেবার চেষ্টায় বল্লাম—ও এমনি গাঁয়ের লোক।

আর একজন বল্লে—তোমার ডাকনাম কি গোপাল নাকি হে গ্রামে?

—হ্যাঁ—না—এই—

বুড়ী বল্লে—কাল রাত্তিরে কি গরম পড়ল। গোপাল ঘুমুতে পেরিলি কাল? মুই চোখ বুজিনি সারারাত।

বেশ করনি! ভালো বিপদেই পড়া গেল যে সকালবেলা। আজ না এলে কি চলতো না বুড়ীর?

বন্ধুটি পুনরায় বল্লে—ও গোপাল বলচে কাকে হে?

—ইয়ে—হ্যাঁ, আমাকেই বলচে—

কথা শেষ করে ঈষৎ হেসে মাথার দিকে দুটি আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করে বল্লাম—মাথাটা একটু—

বন্ধুটি বললেন—ও!

কথা অনুযায়ী কাজের সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে বুড়ীর দিকে চেয়ে যেমন সুরে লোকে দুর্দান্ত পাগলকে সান্ত্বনা দেবার ও স্তোকবাক্য প্রয়োগ করার চেষ্টা করে তেমনি সুরে বলি—আজ যাও, বড্ড ব্যস্ত আছি বুঝলে? কলকাতার বন্ধুরা সব এসেছেন! হ্যাঁ—

ফল সুবিধেজনক হলো না। বুড়ী একগাল হেসে বল্লে—আজ কি এনিচি বলো দিকি গোপাল? এই দ্যাখো—

এতক্ষণ টের পাইনি যে বুড়ী তার পেছন দিকের একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি লুকিয়ে রেখেছে। সেটা সামনের দিকে খুলতে খুলতে বল্লে—সেই যে মেয়েটা মোরে মা বলে, সে দুটো চিঁড়ে কুটলো। আমি বল্লাম, ও কি কুটচিস্? ও বল্লে—কামিনী-সরু ধানের ভালো চিঁড়ে। তোমার গোপালর জন্যি দুটো নিয়ে যেও এখন, কাল বেন-বেলা। আমার মনডা বড্ড খুশী হলো—তা সেও আসচে। সেও তোমারে দেখতি চায়। বড্ড দুঃখী কাঙাল মেয়েটা। ধান ভেনে চিঁড়ে কুটে একরকম করে চালাচ্ছে।

একা রামে রক্ষা নেই, বুড়ীর কথা শেষ হতে দেখি একটা আধফর্সা মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক অদূরে আমতলায় এদিকেই আসচে। আরও বিপদে পড়লাম এই জন্যে যে, ঠিক সেই সময় আমার জ্ঞাতি খুড়োমশায়কেও এদিকে আসতে দেখা গেল। সর্বনাশ! তাঁর বাড়ীতে আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, আর তিনি যদি জানতে পারেন যে এদের হাতে তৈরি চিঁড়ে বা খাবার জিনিস আমি খাই—তাহলেই তো এ পাড়াগাঁয়ে আমার হয়েছে! চিঁড়ে যে ওরা আজই প্রথম এনেচে একথা কি তিনি বিশ্বাস করবেন? আজ দুধ, কাল চিঁড়ে—

রুক্ষ সুরেই বল্লাম—এখন যাও না—দেখচো না ব্যস্ত আছি?

—চিঁড়ে ক'টা নেবার একটা কিছু দ্যাও বাবা।

—ওসব এখন নিয়ে যাও—হ্যাঁ, হ্যাঁ—পরে হবে। এখন যাও—

বুড়ী একটু অবাক হয়ে বল্লে—তা চিঁড়ে ক'টা—

খুড়োমশায় প্রায় এসে পড়েছেন দাওয়ার ধারে।

হাত নেড়ে নেড়ে ফেলবার ভঙ্গিতে বুড়ীর দিকে চেয়ে বলি—আঃ নিয়ে যাওনা—ভালো জ্বালা!

খুড়োমশায় বল্লেন—কি ওতে? কি বলচে জমিরের স্ত্রী?

—কিচ্ছু না। ইয়ে বিক্রি করতে এসেচে—যাও এখন—

ভগবান জানেন বুড়ী আমার কাছে চিঁড়ের বদলে পয়সা নিতে আসেনি।

খুড়োমশায় বল্লেন—তোমার এখানে ওর বড্ড যাতায়াত—

কথাটা চাপা দেবার জন্যে বল্লাম—আমার এই বন্ধুরা একদিন মাছ ধরবার কথা বলছিলেন, তা ভাদুড়ীদের পুকুরে কি সুবিধে হবে?

পুনরায় গ্রামে এলাম মাস পাঁচ ছয় পরে, আশ্বিন মাসের শেষে।

কয়েকদিন পরে ঘরে বসে আছি, বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে কে ক্ষীণ নারীকণ্ঠে

জিজ্ঞেস করলে—বাবু ঘরে আছেন গা?

বাইরে এসে দেখি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে যাকে বুড়ীর সঙ্গে দেখেছিলাম সেই মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটি। আমায় দেখে সলজ্জভাবে মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দেবার চেষ্টা করে সে বল্লে—বাবু কবে এসেচেন?

—দিন পাঁচ ছয় হলো। কেন?

—আমিও তাই শোনলাম। বলি একবার যাই। আমার সেই মা পেটিয়ে দেলে, বল্লে দেখে এসো গিয়ে।

—কে?

—ওই সেই বুড়ী—এখানে যিনি আসতো। তেনার বড্ড অসুখ—এবার বোধহয় বাঁচবে না। গোপাল কবে আসবে, গোপাল কবে আসবে—অস্থির, আমারে রোজ শুধোয়। আমি বলি, তিনি কলকাতায় চাকরি করেন, সব সময় কি আসতে পারেন? কি মায়া আপনার ওপর, আর-জন্মে মনে হয় পেটে ধরেল। এ-জন্মে তাই এত টান—একবার দেখে আসুন গিয়ে। বড্ড খুশি হবে তাহলি—

উদাসীনভাবে বল্লাম—ও!

মন তখন অন্য চিন্তায় বিব্রত। এবার কাউন্সিল ইলেকশনে দুটি বন্ধুর পক্ষ থেকে ভোট সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে বেরিয়ে লোককে অনুরোধ করবার গুরুভার নিয়ে এসেচি। কাল থেকেই বেরুতে হবে, মোটর আসবে। কি ভাবে কি করা যায়, সে কথাই চিন্তা করছিলাম। কোথায় কোন বুড়ীর অসুখ হয়ে আছে, ওসব দেখবার সময়াভাব।

স্ত্রীলোকটি বল্লে—ওবেলা যাবেন বাবু?

—আচ্ছা—তা—এখন ঠিক বলতে পারচিনে—

স্ত্রীলোকটি অনুনয়ের সুরে বল্লে—একবার যাবেন বাবু ওবেলা। হয়তো বুড়ী বাঁচবে না—

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার পথে দেখতে গেলাম বুড়ীকে। খুব উঁচু দাওয়া, সেকালের প্রণালীতে তৈরী পাঁচচালা ঘর। বুড়ীর স্বামীর আমলে আমার জন্মগ্রহণের পূর্বে এ ঘর তৈরী হয়েছিল, তখন এদের অবস্থা যে ভালো ছিল, এই প্রশস্ত পাঁচচালা ঘরখানাই তার নিদর্শন। কিন্তু ঘরখানার সংস্কার হয়নি অনেকদিন, খড় উড়ে পড়চে চালা থেকে, দড়ি বাখারি ঝুলচে, মাটির দাওয়া নানান স্থানে ভেঙে পড়চে, বাঁশের খুঁটি নড়বড় করচে।

বুড়ী শুয়ে আছে একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর, মাথায় তেলচিটে মলিন বালিশ। বুড়ীর সেই পাতানো মেয়েটি পাশে বসে ছিল, আমায় দেখে বুড়ীকে বল্লে—অ মা, কে এয়েচে দ্যাখো—অ মা—

আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই বুড়ী চোখ মেলে আমার দিকে চাইলে। পরে আমাকে চিনে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করতেই বল্লাম—উঠো না, উঠো না—ওকি?

বুড়ী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বল্লে—ভাল আছো আমার গোপাল? বসতে দে গোপালকে! বসতে দে গোপালকে—বসতে দে—

—বসবার দরকার নেই, ব্যস্ত হয়ো না। থাক্—

—ওখানা কেন দিচ্চিস্? গোপালেরে ওই খাজুরের চটখানা পেতে দে—

পরে ঠিক যেন আপনার মা কি পিসিমার মত অনুযোগের সুরে বলতে লাগলো—তোর জন্যি খাজুরের চটখানা কদ্দিন আগে বুনে রেখেলাম। ওখানা পুরনো হয়ে ভেঙে যাচ্চে। তুমি একদিনও এলে না গোপাল—অসুখ হয়েচে তাও দেখতে আসো না—

আমি বল্লাম—আচ্ছা, চুপ করে শুয়ে থাকো। ব্যস্ত হয়ো না।

ইতিমধ্যে পাড়ার অনেক লোক এসে জড়ো হলো, আমি এসেচি দেখে। কেউ কেউ বল্লে—বুড়ী কেবল আপনার কথা বলে বাবু। আপনাকে দেখবার বড্ড ইচ্ছে। বুড়ী বোধহয় এবার বাঁচবে না।

বুড়ীর দুচোখ বেয়ে জল পড়চে গড়িয়ে। আমায় বল্লে—গোপাল, যদি মরি আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস—

পাশের লোককে জিজ্ঞেস করলাম—সে কি?

—জানেন না বাবু? মাটি দেবার সময় নতুন কাপড় কিনে পরিয়ে দিতে হয়—

—ও বুঝেচি।

আমাকে পেয়ে বুড়ী খুশি হয়েচে। কত কি বলতে লাগলো—ওর নাতজামাই লোক কেমন খারাপ, এমন যে অসুখ একবার চক্ষু দিয়ে দেখেও যায় না। ঘর? তা দশ বছর খড় পড়েনি চালে। পচে গলে গিয়েচে পুরনো খড়। নাতজামাইকে বলেছিল, সে জবাব দিয়েচে, অত বড় হাতী ঘর আমি ছাইতে পারব না। পাশে একটা ছোট কুঁড়েঘর বেঁধে থাকো।

বুড়ী চোখের জল মুছে বলে—তা থাকতি পারি হ্যাঁ বাবা? কি নোকের পরিবার আমি। আজই নাহয় কপাল পুড়েচে। তা বলে কুঁড়েঘরে থাকতি পারি মুই?

সান্ত্বনা দেবার সুরে বল্লাম—কথা ঠিকই তো।

—বলো তুমি গোপাল!

ঘাড় নেড়ে বলি—সত্যি তো।

আজও সেই চালাঘর, সেই ম্লান সন্ধ্যা, ছেঁড়া মাদুরে শোওয়া আমার বুড়ীকে মনে পড়ে! ছেঁচতলায় শীর্ণ লাউগাছ, পেছনে কয়েক ঝাড় বাঁশ, এক-আধটা খেঁকি

কুকুরের আওয়াজ পাড়ায়। শান্ত ছায়া নেমে এসেচে সামনের সারা উঠোনটাতে। কতকগুলো মেয়েপুরুষ খেতে এসে দাওয়ার ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

আসবার সময় বুড়ীর পাতানো মেয়েটির হাতে কিছু দিয়ে এলাম পথ্য ও ফলের জন্যে। হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবে না, এই অসুখ থেকে উঠবে না। বুড়ী কিন্তু সেযাত্রা সেরে উঠলো। দিব্যি সেরে উঠলো। আমি কলকাতায় চলে যাবার আগে দু-একবার আমার কাছে লাঠি ধরে ধরে গেল। বসে বসে আপনার মনে কত কি বকে, তারপর চলে আসে।

বছর-দুই কাটলো। এই দুই বছরের মধ্যে যখনই গিয়েছি গ্রামে, বুড়ী এসে বসে, কিছু না কিছু নিয়ে আসবেই। অসুখটা থেকে উঠে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সে দুর্বলতা ওর আর সারলো না।

আমি বলতাম—কেন আসো রোজ রোজ অতদূর থেকে?

—এই পাকা নোনাডা ভাবলাম গোপালেরে দিয়ে আসি—

—তা হোক, তুমি কষ্ট করে এসো না এরকম।

—তুই তো আমাকে দেখতি যাবিনে কোনদিন—

—সময় পেলেই যাবো। এখন বাড়ী যাও।

কখনও বুড়ী বলত—অ গোপাল, তুই বিয়ে করলি নে কেন?

—মেয়ে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, বয়েস হয়ে গিয়েচে।

—কিছু বয়েস হয়নি। কাঁচা ছেলে তোমরা। (আমার বয়েস তখন চল্লিশ।)

—বেশ।

—ওই মুখুজ্যেদের বাড়ী একটা বড় মেয়ে আছে, তোমার সঙ্গে মিল হবে। বলে দেখবানি ওদের।

—আমার ঘটকালি করবার লোকের যখন দরকার হবে, তখন তোমায় ডেকে পাঠাবো। এখন যাও।

কিন্তু বুড়ী আমার কথা শোনে না। একদিন মুখুজ্যেবাড়ীর নুরু আমায় ডেকে বল্লে—ওহে একটা কথা বলি। আজ জমির করাতীর বৌ-বুড়ী বাড়ীর মেয়েদের কাছে গিয়ে বলচে কি, গোপালের সঙ্গে তোমাদের পুঁটির বিয়ে দাও। মেয়েরা তো অবাক, গোপাল কে? শেষে জানা গেল—তুমি। ওরা তো শুনে আশ্চর্য। তা তুমি কিছু বুড়ীকে বলেছিলে নাকি এ সম্বন্ধে?

আমি নিজেকে নিতান্তই বিপন্ন ও অসহায় বোধ করলাম। বল্লাম—সে কি কথা। কক্ষনো না। তুমি বিশ্বাস করো—

—না—না, বিশ্বাস অবিশ্যি করিনি। যাই হোক, যদি কিছু করেও থাকো বুড়ীকে বারণ করে দেবে আর না বলে। গ্রাম ভালো নয়, ও নিয়ে মেয়েটার নামে একটা

কথাকথি যদি হয়—

—নিশ্চয়। তুমি বিশ্বাস করো ভাই, আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি নে।

বুড়ী তার পরদিন যেমন সকালে এসেচে বকলুম ওকে। কে তাকে এসব কান্ড করতে বলেচে। ঘটকালি করতে ডেকেছিল কেউ তাকে? গাঁয়ে এই নিয়ে শেষে একটা কথা উঠবে, পাড়াগাঁ জায়গা খারাপ। তুমি বাপু এখানে আর এসো না।

বুড়ী ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে বল্লে—বকিস্ নে অ গোপাল, মোরে বকিস্ নে। তা তুই ও মেয়েডারে বিয়ে না করিস—অন্য কোন মেয়ে বিয়ে কর। পুঁটিরে তোর পছন্দ হয়নি, না?

ধমকে উঠে বল্লাম—আবার ওইসব কথা!

নিতান্ত সরলা সেকেলে বুড়ী, কিছু বোঝেও না।

সত্যিই এই ঘটনা নিয়ে গ্রামে একটু কথাবার্তার সৃষ্টি হলো। বুড়ীর ওপর খুব চটে সকালবেলাটা আর ঘরেই থাকিনে, পাছে বুড়ী এসে জ্বালাতন করে। দশ-বারোদিন পরে একদিন দুপুরে ঘুমিয়ে উঠেচি, বাইরে বুড়ীর গলা শোনা গেল, —অ মোর গোপাল!

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লাম—কি? আবার এসেচ কেন এখানে?

—একটা বাতাবী নেবু নিয়ে এয়েলাম তোমার জন্যি—

—দরকার নেই বাতাবী নেবুতে। যাও এখন—

বিরক্তি নিতান্ত অকারণ নয়। মাত্র চার-পাঁচদিন আগে মুখুজ্যেবাড়ীর ঘটনা নিয়ে আমার জ্ঞাতি খুড়ো আমায় দুকথা শুনিয়ে দিয়েচেন।

বছরখানেক আর গ্রামে যাইনি এর পরে। বোধহয় দেড় বছরও হতে পারে। একবার শেষ শরতে পুজোর ছুটির পর কাশী থেকে বেরিয়ে ফিরে কলকাতায় এসে দেখি তখনও দিন দুই হাতে আছে। গ্রামেই গেলাম এই দুদিন কাটাতে। গ্রামে ঢুকতেই প্রথমে দেখা পরশু সর্দারের বৌ দিগম্বরীর সঙ্গে। দিগম্বরী অবাক হয়ে বল্লে—ও মা, আজই তুমি এলে বাবাঠাকুর? সে বুড়ী যে কাল রাতে মারা গিয়েছে। তোমার নাম করলে বড্ড। ওর সেই পাতানো মেয়ে আজ সকালে বলছেল—

আমি এসেচি শুনে বুড়ীর নাতজামাই দেখা করতে এলো।—বাবু এসেচেন? সাহায্য করুন, কাফনের কাপড় কিনতি। যা দাম কাপড়-চোপড়ের!

আমার মনে পড়ল বুড়ী বলেছিল সেই একদিন—আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস্ বাবা। ওর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর বারাণসী থেকে আমায় কি ভাবে আহ্বান করে এনেচে। আমার মন হয়তো ওর ডাক এবার আর তাচ্ছিল্য করতে পারেনি।

কাপড় কেনবার টাকা দিলাম। নাতজামাই বলে গেল—মাটি দেবার সময় একবার যাবেন এখন বাবু। বেলা বারোটা আন্দাজ যাবেন—

শরতের কটূতিক্ত গন্ধ ওঠা বনঝোপ ও মাকাললতা দোলানো একটা প্রাচীন তিন্তিরাজ গাছের তলায় বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হচ্ছে। আমি গিয়ে বসলাম। আবদুল শুকুর মিঞা, নমর, আমাদের সঙ্গে পড়ত আবেদালি, তার ছেলে গনি—

এরা সকলে গাছের ছায়ায় বসে। প্রবীণ শুকুর মিঞা আমায় দেখে বল্লে—এই যে বাবাঠাকুর এসো। তামুক খাবা? বুড়ীর মাটি দেবার দিন তুমি কনে থেকে এলে, তুমি তো জানতে না? তোমায় যে বড্ড ভালোবাসতো বুড়ী। তোমার কাছে কাফনের কাপড় নিয়ে তবে ওর মহাপ্রাণীডা ঠাণ্ডা হলো। খাও তামুক—

একটি গরুর গাড়ীর পুরনো কাঠামোর ওপর বৃদ্ধাকে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুইয়ে রেখেচে। দুজন জোয়ান ছেলে কবর খুড়চে। কবর দেওয়ার পর সকলে এক এক কোদাল মাটি দিলে কবরের ওপর। শুকুর মিঞা বল্লে—দ্যাও বাবাঠাকুর, তুমিও দ্যাও—তুমি দিলে মহাপ্রাণী ঠাণ্ডা হবে—

দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো—অ মোর গোপাল।